



নৈতিকতার আলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশঃ একটি নৈতিক উপস্থাপনা

প্রসেনজিৎ গায়ন

সহকারী অধ্যাপক, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

Abstract: For a long time, human indiscriminate attitude towards the environment and excessive usage of natural resources have been causing irreparable damage to the environment and its harmful effect are now beginning to affect the entire animal Kingdom. The environment is rapidly degrading due to excessive uses of natural fuel, discharge of industrial waste into water bodies and destruction of forest etc. So it is time to consider the work of protecting the natural environment as a part of everyday life and for that of course some moral rules must be followed, that is moral responsibility will be the basis of the relationship between human life and the environment. This kind of responsible morality is eco-centric morality and its main purpose is to conduct all life on the basis of a moral relationship with the environment for the benefit of present and future living being. Such ethics never evaluates individuals or societies in terms of worldly pleasures and self-interest. It rejects the ideal of materialistic and consumerist society and emphasizes on thrift in the usage of environment and the moderate usage of resources. At the same time this morality teaches us that, it is moral duty to protect the naturalness of peaceful and secluded forest and the natural flow of a river for long term benefits without their exploitation for short term economic gain. This ethics allows travel by hand-powered boats or foot-powered vehicles instead of all types of vehicles powered by mineral oil and it opposes the arbitrary destruction of nature for luxurious lifestyle. In short, this form of morality emphasizes a very simple and unpretentious lifestyle with very moderate and limited usage of environment, but this does not mean that, this morality tells us to abstain from material pleasures. In fact this morality does not believe that, there is happiness in the intemperate enjoyment obtained through arbitrariness. Actually, it inspires us to find long lasting pleasures or natural joy by connecting ourselves with the entire nature in a bond of love and heartiness.

মূল শব্দাবলী: প্রাকৃতিক সম্পদ, স্বৈচ্ছাচারিতা, নৈতিক বিশ্ব, নৈতিক দায়বদ্ধতা, নান্দনিক শোভা

ভূমিকা: মানব সভ্যতা প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষ, পাহাড়, নদনদী, পশুপক্ষী, আলো,

বাতাস, জল, মাটি, বনাঞ্চল প্রভৃতি নিয়ে যে সমগ্রতা সেটাই হল প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই সমগ্র পরিবেশের

মধ্যে মানুষই একমাত্র বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব হওয়ায় এই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব ও তার। কিন্তু দেখা গিয়েছে অশুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিরন্তর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সর্বগ্রাসী লোভ ও অপরিণামদর্শিতাবশত প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার ও অপচয় করে মানবজাতি সহ সমগ্র প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের অস্তিত্বকে সংকটপূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি মানুষ তাদের জীবন রক্ষার তাগিদে যাকিছু প্রয়োজন, তার সবই পরিবেশ থেকে আদায় করে নেয় স্বেচ্ছাচারিতায় ভর করে। ফলে বহুকাল ধরে মানুষের দ্বারা পরিবেশের অপরিমিত ব্যবহার হেতু জীবনের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আজ অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে পরিবেশ রক্ষার প্রতি মানুষের নৈতিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়ার। এজন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যা নামক নীতিবিজ্ঞানের একটি শাখা মানুষ ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের স্বীকৃতি জানিয়েছে। অর্থাৎ এরূপ নীতিবিদ্যা অনুসারে সমগ্র প্রকৃতি হবে মানুষের নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক Peter Singer এর Practical Ethics গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে পরিবেশ নৈতিকতার মূল বিষয়বস্তুটি বোঝা যেতে পারে ঃ

" একটি স্রোতস্বিনী পার্বত্য নদীকে বৃক্ষতরুলতা আচ্ছন্ন গিরিখাতের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান দেখে যদি জল-বিদ্যুত পরিষদের উদ্যোগে কোন একটি গিরিখাতের মধ্যে নদীর মুখটি আবদ্ধ করে নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়, তবে সহস্র মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে যা দেশের বিদ্যুতের চাহিদা বহুলাংশে মেটাবে। এছাড়া ও এতদ্বারা আরও নানা শক্তিবান্ধব শিল্প স্থাপিত হবে, ফলে আরও কিছু কর্মসংস্থান ও আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

বিপরীতদিকে উক্ত বাঁধ নির্মাণ করা না হলে নদীটি জীবকুলের অন্য উপকারে আসবে। নদীতীরে বহু মানুষ নান্দনিক শোভা উপভোগ করার জন্য আসবেন, খরস্রোতা নদীটি দুঃসাহসী ভ্রমণপিপাসুদের নৌকা বিহারের স্থান হবে, হাজারো বছরের প্রাচীন

পাইন গাছ দাঁড়িয়ে পার্বত্যময় প্রকৃতির শোভা বর্ধন করবে। পাশাপাশি ঘনবন আচ্ছন্ন নদী- উপত্যকাটি হয়ে উঠতে পারে বহু পশুপক্ষীর (যাদের আনেকপ্রজাতি আজ বিরল) নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাছাড়া বনাঞ্চলটি এমন অনেক বিরল প্রজাতির বৃক্ষ-তরুলতায় আচ্ছন্ন থাকবে যা অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। "

এখন প্রশ্ন হল – উপরোক্ত দুটি দৃষ্টিকোণের মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে নদীটির উপর বাঁধ নির্মাণ সম্ভব অথবা অসম্ভব? বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কল-কারখানা নির্মাণ অথবা খনির পত্তন কিছু মানুষের কর্মসংস্থান ও সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হলেও পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণও উপেক্ষণীয় নয়। কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিকটবর্তী জলাশয়কে দূষিত করবে এবং কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা ওজন স্তরের ক্ষতিসাধন ও বায়ুস্তরের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটবে যা জীব ও উদ্ভিদের জীবনে এক ভয়াবহ বিপদসংকেত।

সুতরাং নৈতিক বোধ থেকে এটা ভাববার গুরুত্বপূর্ণ সময় এসেছে যে, পরিবেশ দূষণকে উপেক্ষা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত অথবা অর্থনৈতিক উন্নতিকে উপেক্ষা করে দূষণমুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? পরিবেশ নৈতিকতার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিকল্পটিই আমাদের নৈতিক বিচারে সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। কেননা সেটা হলে শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুস্থ জীবনধারণ বিষয়ে নিশ্চিত মনের অধিকারী হতে পারবে।

পাশ্চাত্য ভাবনা প্রসূত পরিবেশ ঃ প্রকৃতি ও তার পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি দুটি প্রধান ভাবধারায় বিভক্ত, যথা বাইবেলে বর্ণিত খ্রিস্টানদের ভাবধারা এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ভাবধারা। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টি তত্ত্ব হলো একটি ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনা যেখানে ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষের একটা বিশেষ অবস্থান নির্ধারিত। এখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর তার নিজের মানসপুত্র মানুষকে সৃষ্টি করে জগতের উপর তার আধিপত্য অর্পণ করেন। জল, স্থল এবং

পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর মানুষকে তার প্রয়োজন অনুসারে কর্তৃত্ব করার অধিকার দান করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশবলে বিশ্বের প্রাণী ও অপ্রাণী সবই মানুষের সম্পদ। ফলত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন ঈশ্বরের পুত্র মানুষকে হত্যা করা অনুচিত হলেও খাদ্য বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদন, পশুপক্ষী হত্যা অন্যায় নয়। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন ও মানুষের প্রয়োজনে পশু হত্যা ও বৃক্ষচ্ছেদনকে অন্যায় বলেননি। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সহমত পোষণ করে বলেন যে, এই জড়জগৎ ও জীবজগতের বিবর্তন ঘটেছে মানুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই। উদ্ভিদের প্রয়োজনে আলো বাতাস জলস্থল সমাকীর্ণ জড়জগৎ; পশুপক্ষীদের প্রয়োজনে উদ্ভিদজগৎ ; আর প্রাণী জগৎ উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ প্রভৃতি সবকিছুই মানুষের প্রয়োজন সাধক রূপেই বিবর্তিত হয়েছে।

সুতরাং উক্ত দুই ভাবধারার সারবত্তা হলো মানুষ সমাজকে কেন্দ্র করেই ন্যায়-অন্যায়ের বা ন্যায্য-অন্যায্যতার প্রশ্ন বিবর্তিত। মানুষের জীবনেরই কেবল স্বকীয় মূল্য রয়েছে। মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সবকিছুই মানুষের ভোগের জন্য মূল্যবান অর্থাৎ তাদের মূল্য পরকীয়। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মূল স্রোত দাবি করে যে, প্রকৃতি জগৎ মানুষের নিমিত্ত। স্বয়ং ঈশ্বর এই জগতের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র মানুষকেই প্রদান করেছেন এবং কিভাবে মানুষ তার ব্যবহার করবে তা ঈশ্বরের বিচার্য নয়। কাজেই মানুষই নৈতিকভাবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ফলে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণী জগতের ধ্বংস সাধন অন্যায় রূপে বিচার্য না হলেও পশুপক্ষী হত্যা ও বনানী ধ্বংস যদি কোন প্রকারে মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে তা অবশ্যই অনুচিত কর্ম হবে।

উপরোক্ত অভিমত সত্ত্বেও পরবর্তীতে পাশ্চাত্য চিন্তা ধারাকে প্রকৃতির সংরক্ষণ বিষয়ে বিকশিত হতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য ভাবধারা এটাও দাবি করেছে যে, মানুষের উচিত প্রকৃতির সম্পদকে এমন ভাবে ব্যবহার

করতে হবে যাতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। বনাঞ্চল ধ্বংস করে শিল্প সংস্থার পত্তন করলে কলকারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থ এবং জ্বালানি রূপে ব্যবহার্য খনিজ তেল থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ (ক্লোরিন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন মনোক্সাইড, বেনেজিন, সালফার-ডাই-অক্সাইড) বায়ুমণ্ডল কে দূষিত করে ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন করে ও পৃথিবীর আচ্ছাদন রূপ এমন এক উষ্ণ মণ্ডল রচনা করে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জন্য অত্যন্ত হানিকর। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা সেজন্য মনে করেন সমগ্র প্রকৃতি জগৎ মানুষের প্রয়োজনে বিবর্তিত হলেও মানুষ যেন তাদের উপর অবিবেচকের মত আধিপত্য না করে। প্রয়োজন বোধে পশু হত্যা, বনাঞ্চল ধ্বংস ন্যায় হলেও প্রতিক্ষেত্রে বিচার্য হবে এটাই যে, ওই হত্যা বা ধ্বংস মানব জীবনকে সংকটময় পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করায় অথবা করায় না।

প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত পরিবেশ: পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভরতায় ভর করে মানব কেন্দ্রিক পরিবেশ নৈতিকতার কথা বলে সেখানে ভারতীয় ভাবধারা গভীর আত্মোপলব্ধিকে ভিত্তি করে সমগ্র প্রকৃতি কেন্দ্রিক নৈতিকবিশ্ব স্থাপনের স্বীকৃতি দেয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারায় শুধুমাত্র মানুষকেই স্বতঃমূল্যবান গণ্য করা হয় কিন্তু ভারতীয় ভাবধারানুসারে জগতের সমস্ত কিছুই স্বতঃমূল্যবান। কেননা জীব, জড়, উদ্ভিদ সমস্ত কিছুই এক আনন্দময় চৈতন্যের প্রকাশ। ঈশোপনিষদে কথিত হয়েছে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' অর্থাৎ যে চৈতন্যময় ঈশ্বর মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই চৈতন্যময় সত্তাই জলে, স্থলে, অরণ্যে, অন্তরিক্ষে সর্বত্র বিরাজিত। ভারতীয় দর্শনের এ এক অভিনব বাস্তবতন্ত্র যা পার্থিব ভোগবাসনা ও বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং গভীর উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শন তার পরিবেশ চিন্তায় ব্যবহার করেছে বুদ্ধিকে, যুক্তিকে ও প্রযুক্তিকে। অন্যদিকে ভারতীয় দর্শন পরিবেশ চিন্তায় কাজে লাগিয়েছে সেই বিশ্ব উপলব্ধিকে যার থেকে সমগ্র প্রকৃতির প্রতি আত্মিকতা

ও শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত হয়। উপলব্ধির গুরুত্ব অমোঘ। কেননা তা যুক্তির মানদণ্ডকে অস্বীকার করে জন্ম দেয় অহিংসাত্মক পবিত্র মননকে। তাই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের ভোগ্য বিষয় ও আমরা সেগুলোর প্রভু বিবেচিত হই সেখানে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের ভোগ্য প্রকৃতিকে শ্রদ্ধার বিষয় রূপে গণ্য করে। এখানে মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয় বা প্রকৃতি মানুষের অধিকৃত সম্পত্তি নয়। যে পরমসত্তা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিধৃত তাই সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যপ্ত। মানুষের সাথে প্রকৃতির এই আত্মিক ও নিবিড় বন্ধনই হলো ভারতীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার ভিত্তি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধনের অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর শ্রদ্ধাবোধ থেকে জন্ম হয় প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও নৈতিক দায়বদ্ধতা যেগুলি পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিস্বরূপ।

বিশ্বকবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘তপোবন’ শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। বিশ্বকবি সেখানে বলেছেন :

“মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ: কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে যায়।

ভারতবর্ষ তার জীবনে প্রকৃতিকে আহ্বান করেছে এবং যোগ সাধনায় ব্রতী হয়েছে। যোগ সাধনার অর্থ জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে আমরা মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি। এরই নাম বিশ্বজাগতিকতা । এই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।”

এই জগৎ শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজন মেটানোর বস্তু নয়, কারণ যা শুধু প্রয়োজন সাধন করে তার ব্যবহারিক মূল্য ছাড়া অন্য কোন উদার তাৎপর্য থাকতে পারে না।

‘বিশ্বব্যাপী’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করে এটাও বলেছেন:

“ যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয় আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজেই ক্ষুদ্র তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে, তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমনকি যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার অফিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়।.... জগতকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এই জন্য তার জল-স্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি- তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভূত বলে গণ্য করি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।”

সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহারের যন্ত্রমাত্ররূপে দেখা নৈতিকতার দিক থেকে মোটেই সমীচীন নয়। আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ বলেই প্রকৃতি মূল্যবান নয়। বরং প্রকৃতি মানুষের মতোই স্বতঃমূল্যবান কারণ তা চৈতন্যময় ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যপ্ত। ঈশ্বরের প্রতি যদি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় তবে তার দ্বারা প্লাবিত বা তার অপরিহার্য অংশ এই চৈতন্যময় প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাব আসবে না কেন? এই বোধ অবশ্যসম্ভাবী রূপে আমাদেরকে এই নৈতিকবিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবনার জন্ম দেবে এবং মানব হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির সুরক্ষার্থে নৈতিক কর্তব্য জাগ্রত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা: এ কথা ঠিক যে, বনভূমি সংহার করে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান, কাঠজাত দ্রব্যের ব্যবসায় মুনাফা অর্জন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনে বনাঞ্চল জলমগ্ন করানো প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নতি হয় । কিন্তু তা স্বল্প মেয়াদী এবং এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতি নিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন

হতে হবে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে। তাই প্রশ্ন ওঠে মানুষের স্বার্থে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশ ধ্বংস করা সম্ভবত অথবা অসংগত?

মানুষ অনাদিকাল থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র সাময়িক মুনাফার হিসেবে বহু প্রাকৃতিক সম্পদ নির্বিচারে বিনষ্ট করে চলেছে। কাজেই এমন আশঙ্কা মনে তৈরি হওয়া স্বাভাবিক যে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন হতে চলেছে যান্ত্রিক। ফলে তাদের হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি গুলি বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে অর্থ তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত ব্যবসায়িক বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হচ্ছে। যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভবিষ্যতে মানুষের কাছে নিসর্গশোভার কোন অবদানই থাকবে না, বরং সাময়িক সুখ প্রদানকারী কিছু পণ্য কেন্দ্রিক বিলাসিতাময় জীবন যাপন অথবা কম্পিউটার বা মোবাইল কেন্দ্রিক নানারকম বুদ্ধির খেলা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানববন্ধন পরিবেশ ধ্বংসের খেলা প্রভৃতিতে মেতে থাকাটা বেশি পছন্দের বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে আগামী প্রজন্মের কাছে। তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত বনানী, গিরিশ্রেণী, নদনদী, পশুপক্ষী ইত্যাদি হবে মূল্যহীন। অর্থাৎ তারা প্রাকৃতিক অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি কোন গুরুত্বই না দিয়ে নিযুক্ত থাকতে পারে আর্থিক সমৃদ্ধিকর ব্যবসায়িক কর্মে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা হবে এক চরম অভিশাপ... শান্ত-সুন্দরের স্পর্শহীন শ্রান্ত-ক্লান্ত জীবনের অভিশাপ। ভবিষ্যৎ জীবন যাতে এরূপ অভিশাপ না হয় তার দায়ভার তুলে নিতে হবে আমাদেরকেই। আর তার জন্য দরকার হবে অবিকৃত রূপে পরিবেশের সম্পদ রক্ষণ, সৌন্দর্য উপলব্ধির অঙ্গ হিসেবে সন্তান সন্ততিদের সাথে নিয়ে বনভূমি, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি পর্যটনের মাধ্যমে প্রকৃতি প্রেম জাগ্রত করা, নিয়ম করে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে ভালোবাসা, প্রেম সৌন্দর্য- অনুভূতির মতো সুকোমল বৃত্তি গুলির মৃত্যু না ঘটে।

আধুনিক সভ্যতায় প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ নিজের সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজতে প্রকৃতির প্রতি তার আবিবেকী মনোভাবের ও অপরিণামদর্শীতার পরিচয়

দিয়েছে। তাই আজ প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের মুখে-বৃক্ষ- তরুলতা, বহু প্রজাতির পশু পক্ষী আজ বিলুপ্ত, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ দূষিত, সুস্থ শরীরে জীবনধারণ আজ শঙ্কার মুখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে হায়দ্রাবাদ প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটি উন্নত শহর। এখন আরো উন্নতির লক্ষ্যে যদি বনাঞ্চল ধ্বংস করে বিস্তীর্ণ রাজপথ তৈরি, নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে তার ওপর একটি বাঁধ নির্মাণ, পর্যটন ব্যবসার স্বার্থে পর্বত শিখরে পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে দেশের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলেও তার প্রাকৃতিক বৈভব নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহরটি অতুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ছিল- পার্বত্য নদীর ঝরনা ও আদিম কালের শিলা পরিবৃত্ত বিজন পাহাড়, পশুপক্ষী পরিবৃত্ত বিজন বনভূমি, উন্মুক্ত আকাশ ও নির্মল বাতাস এসব অতুল প্রাকৃতিক বৈভবের জন্য শহরটির নাম ছিল 'ভাগ্যনগর'। স্বার্থান্বেষী, আমিতাচারী লোভী মানুষ সেই অতুল ঐশ্বর্য ধ্বংস করে ভাগ্য নগরকে আজ হায়দ্রাবাদ শহরে পরিণত করেছে এবং অবশিষ্ট অংশের বিনষ্টিকরনের হাত ধরে সেই হায়দ্রাবাদ আবার আজ হতে চলেছে প্রযুক্তির তীর্থভূমি 'সাইবার নগর'। সাইবার সিটি মানুষের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের অন্তরায় হবে- এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

কাজেই ভবিষ্যতে জীবের সুস্থ ও নিরাপদ জীবন ধারণ নিশ্চিত করতে হলে আমাদের নৈতিক কর্তব্য হবে প্রকৃতির অবশিষ্ট অক্ষত সম্পদের রক্ষণের দিকে যত্নশীল হওয়া। প্রযুক্তির হাত ধরে দেশ বা জাতি নিজ নিজ পারদর্শিতা ও ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, বিষাক্ত ধোঁয়া, বোমা বারুদ থেকে নির্গত জীবনঘাতী দূষিত গ্যাসীয় পদার্থ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর ও অসুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এছাড়া বেহিসাবীর মত বনসম্পদ ধ্বংস হেতু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য জীবন অধ্যুষিত ধরিত্রীকে একসময় বন্ধ্য বানিয়ে ছাড়বে! অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি কাম্য হলেও মানব সভ্যতাকে এ বিষয়ে সংযমী ও যত্নশীল হতে হবে যাতে ওই শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের

লোভ সর্বগ্রাসী হয়ে না ওঠে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে অবিবেচকের মত প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে পরিবেশকে দূষণের মুখে ঠেলে দেওয়া অন্যায়-ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে পরিবেশের সংরক্ষণই হবে ন্যায় সঙ্গত।

মনুষ্যের প্রাণী/উদ্ভিদের প্রতি নৈতিক মর্যাদা:

মানবজাতির হিতের কথা মাথায় রেখে পরিবেশ বিষয়ক নৈতিক আলোচনার পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টি পরিবেশ নীতিবিদদের ভাবায় তা হল মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যের প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বার্থ রক্ষার কি কোন নৈতিক মূল্য থাকতে পারে না? ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় মূল্য শব্দটির দুটি অর্থের কথা বলা হয়েছে- স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য। যা নিজে নিজেই ভাল বা মূল্যবান তা হলো স্বতঃমূল্যবান এবং পরতঃমূল্যবান হলো সেই সকল বস্তু যাদেরকে অন্যের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে কাজে লাগানো হয়। এই প্রসঙ্গে মানবের প্রাণী ও উদ্ভিদে স্বতঃমূল্যের প্রশ্নটি এসে পড়ে। প্রশ্ন হল প্রাণী ও উদ্ভিদ কি শুধুই পরকীয় মূল্যে মূল্যবান? অর্থাৎ তাদের মূল্য কি শুধুই মানুষের প্রয়োজন রক্ষার্থেই? কাজেই প্রশ্ন ওঠে যখন পার্বত্য নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন শুধুমাত্র মানুষের আর্থিক আনন্দ- প্রমোদমূলক হিতের কথা চিন্তা না করে অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ তথা সার্বিক পরিবেশের বাস্তবতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত নয় কি? যেখানে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগত একই পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কে জড়িয়ে আছে! Peter Singer এর মতে শুধুমাত্র জীবকুলের স্বার্থের মাপকাঠিতে উদ্ভিদ জগতের মূল্যের বিচার করা অনুচিত। মনুষ্য নির্মিত বাগানের বৃক্ষরাজি সূর্যের আলো এবং মানুষের সহায়তায় জল, সার পেয়ে বৃদ্ধি পেলেও বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি প্রকৃতির নিয়মে বড় হয়ে ওঠে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আর তা যদি হয় তাহলে বৃক্ষরাজীর স্বতঃমূল্যের স্বীকৃতি দেওয়া মানুষের কর্তব্য, তা জীবকুলের স্বার্থে ব্যবহৃত হোক বা না হোক। আমাদের স্বভাবজাত জটিল সমস্যা হল এই যে আমরা স্বীয় স্বার্থ উপলব্ধির বাইরে বিবিধ প্রাণের সমৃদ্ধির উপর

যথাযথ গুরুত্ব দিতে নারাজ! ব্যবহারিক নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটানো একান্ত আবশ্যিক। আমাদের উচিত জাগতিক প্রতিটি বস্তুতে প্রাণের উপলব্ধি করা এবং মানুষ পশুপক্ষী বৃক্ষ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সবকিছুর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক তাদের সংরক্ষণ। কেননা নৈতিকতার দৃষ্টিতে এদের প্রত্যেকেরই জীবনের স্বকীয় মূল্য অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক, নীতিজ্ঞ ও মানবতাবাদী Albert Schweitzer এর একটি বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। বক্তব্যটির সারকথা হলো:

“জগতকে চৈতন্যময়ী রূপে গণ্য করাই হলো সত্যকার দর্শনের বৈশিষ্ট্য। জড়-অজড় সব কিছুরই অনুচ্চারিত বানী হল- ‘বেঁচে থাকার কামনা নিয়েই আমি অনেকের মধ্যে বেঁচে আছি। আমার প্রাণের স্বভাবধর্মে আমি যেমন দীর্ঘায়ু ও বেঁচে থাকার সুখ কামনা করি, জাগতিক প্রতিটি বস্তু ও তাদের প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মে একই কামনা করে থাকে’-যদিও ওই সব কামনা নীরব।” আমেরিকান দার্শনিক Paul Taylor এর বক্তব্য ও এ বিষয়ে তাৎপর্যবাহী। তিনি ‘Respect for Nature’ গ্রন্থে বলেছেন- ‘প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীই তার নিজস্ব অনন্য ভঙ্গিতে তার নিজের মঙ্গল লাভ করবার নিরন্তর প্রয়াস করে থাকে। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে আমরা অপর জীবনের উপর আমাদের সমান মূল্য আরোপ করতে দ্বিধাবোধ করব না’।

ভারতীয় চিন্তাধারাতেও অনুরূপ উপলব্ধির প্রতিফলন দেখা যায়:

বৃক্ষরাজীর প্রাণ ও সুখদুঃখানুভূতি আছে বলে মনুসংহিতায় স্বীকার করা হয়েছে, অগ্নিপু্রানে বলা হয়েছে মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাট্রই বৃক্ষরোপণ করবেন ও তাদের পুত্র স্নেহে পালন করবেন, আবার কঠোপনিষদে আত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে-সূর্যের মধ্যে, কলসের পানিতে, বায়ুর মধ্যে, অগ্নিতে, মানুষে, জলজ বস্তুতে ঔষধি বৃক্ষে, পার্বত্য বস্তুতে, নদনদীতে সর্বত্রই এক আত্মা বিরাজমান।

আমেরিকান বাস্তবতন্ত্রবিদ ও নীতিশাস্ত্রবিদ Aldo Leopold যথার্থই বলেছেন: ব্যক্তিসত্তা পরস্পর

নির্ভরশীল অংশসমূহের সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। গভীর বাস্তুসংস্থানে(Deep Ecology)তাই বলা হয়েছে “সকলেই প্রকৃতি পরিবারের সদস্য। মানুষের ভূমিকা এখানে ভূমি সম্প্রদায়ের বিজেতা হিসেবে নয় বরং সে নিছক ওই পরিবারের সদস্য। ও নাগরিক মাত্র। অন্য সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা এখানে বর্তমান থাকে। এই বৃহৎ পরিবারে সকলেই যেন সকলের আত্মীয়। আত্মীয়তা-দায়বদ্ধতা এখানে ক্রিয়াশীল।” তাঁর মতে মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বের সকল অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উপলব্ধি করে তখনই তার আত্মোপলব্ধি হয় এবং আত্মীয়দের ধ্বংস বা বিনাশ না করে প্রাকৃতিক সবকিছুকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার প্রবণতা তখনই জন্ম নেয়।

সুতরাং বলা যায়, উপরোক্ত চিন্তা ভাবনা সমূহের দ্বারা চালিত হয়ে সমগ্র প্রকৃতির সাথে নিজেদের আত্মীয়তার সম্পর্কে দৃঢ় করে সমগ্র পরিবেশকে হিংসামুক্ত করাই পরিবেশগত নীতিবিদ্যার দিক থেকে একান্ত কাম্য।

উপসংহার: আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের হাত ধরে অমিতাচারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বৈচ্ছাচারী কিছু মানুষের বিবেকহীন মানসিকতা জীব কুলের স্থায়িত্বের ও মধুর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক উৎকর্ষতা ও নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন প্রভৃতির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। তার জন্য মানব সভ্যতা বৃক্ষ তরুলতা ও সামগ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করে প্রতিটি প্রাণের প্রতি অমৃতসম মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করার মত বস্তু যথা কলকারখানা

পরিবেষ্টিত শিল্পনগর, যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান, পারমাণবিক বোমা সহ যুদ্ধের নানারকম আধুনিক সরঞ্জাম প্রভৃতি বিরামহীনভাবে তৈরি ও তার ব্যবহার করে চলেছে যার ভয়ংকর কুপ্রভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সমগ্র প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতকে। বহু শক্তিদ্র দেশ আজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে সুন্দর ও সুস্থ পৃথিবী গড়ার পরিবর্তে পৃথিবী ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। তাই এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে বাস্তুসংস্থানকে

অক্ষত রেখে পরিবেশ দূষণ রোধ না করা গেলে পৃথিবী কোন একদিন প্রাণ শূন্য হয়ে যেতে বাধ্য।

এইরূপ আশঙ্কার কথা চিন্তা করে ১৯৫০ সালের সময়কাল থেকে এক অভিনব নীতিবিদ্যার উন্মেষ ঘটেছে-যথা পরিবেশ মূলক নীতিবিদ্যা যার সার কথা হলো পরিবেশ সুরক্ষার নিমিত্ত খাদ্যবস্তু ও ব্যবহার্য সামগ্রী সম্পর্কে সংযমী, মিতব্যয়ী ও বিবেকী হতে হবে। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত লালসা, দানবিক স্পর্ধা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দান্তিক মানসবৃত্তি যাতে পরিবেশকে বিপন্ন করে প্রাণীজগৎকে বিলুপ্তির পথে দাঁড় করিয়ে না দেয় সে বিষয়ে পরিবেশ নৈতিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সমাজের অগ্রগতির জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে এর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের প্রতি কখনোই অসংযমী ও অমানবিক হওয়া নৈতিক দিক থেকে উচিত নয়। অর্থাৎ পরিবেশ নৈতিকতার দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেবলমাত্র স্বল্প মেয়াদী কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার প্রয়োজনে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা বা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত কর্ম।

পরিশেষে বলা যায়, সুস্থ জীবনের প্রয়োজনে, মধুময় জীবন-যাপনের প্রয়োজনে, সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের প্রয়োজনে, এক কথায় মধুর ও নিরাপদ পৃথিবী গঠনের প্রয়োজনে একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে পরিবেশ কেন্দ্রিক নৈতিক বিশ্ব রচনার। সেজন্য এমন এক নৈতিক সীমারেখা খুঁজে পেতে হবে যা স্বৈচ্ছাচারিতার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যা মানবিকতা ও শ্রদ্ধার দ্বারা সমর্থিত। আর তা পাওয়া যাবে প্রতিটি মানুষের সংযমী, নির্লোভী, মিতব্যয়ী ও অহিংস হওয়ার মধ্য দিয়ে। নচেৎ এমন একটা দিন আসতে বাধ্য যেদিন মানব স্বার্থকেন্দ্রিক পৃথিবী রচনা করতে গিয়ে জন্ম দিতে হবে বক্ষ্যা পৃথিবীর ! সুতরাং মহাকাশে বা মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার উদ্যোগের পাশাপাশি ধরিত্রীর বুকে ফুল ফোটানোর মতো অকৃত্রিম পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ

রাখতে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল ও অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে প্রতিটি নাগরিক সমাজকে।

ঋণস্বীকার:

১. সান্যাল জগদীশ্বর, পাশ্চাত্য নীতি বিজ্ঞান, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, ২০১৪।
২. ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬।
৩. ঘোষ সঞ্জীব, নীতিবিদ্যা ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ২০১৮।
৪. গুপ্ত দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭।
৫. ধর বেনুলাল, ব্যবহারিক নীতিদর্শন, মিত্রম, ২০১৭।
৬. Singer Peter, Practical Ethics, Cambridge University Press, 1993.
৭. Taylor Paul W, Respect for Nature, Princeton University Press, 1986.